অন্নদাশঙ্কর রায়ের রচনাবলী

অষ্টম খণ্ড

BCSC ... Library
23.23
No. 10050

একশো সত্তর টাকা

ভূমিকা

তেইশ বছব বযসে ইউবোপ যাত্রাব পূর্বে আমি দশ-এগাব বৎসর ধরে ইউবোপের সাহিত্য, ইউরোপের ইতিহাস, ইউরোপেব ভূগোল ও ইউবোপের খবব আগ্রহের সঙ্গে পডেছিলুম। কাজেই সেখানে গিয়ে আমি খুব সহজেই চেনাশোনা কবতে পাবি। তাহলেও মানুষগুলো তো ইতিহাসেব বা উপন্যাসেব মানুষ নয, জলজ্যান্ত মানুষ। প্রত্যেক দিনই নূতন নূতন মুখ দেখি, নূতন নূতন কথা শুনি, নূতন নূতন বিষয শিখি। থিযেটাব, কনসার্ট, আর্ট গ্যালাবী, মিউজিয়াম, ক্যাথিড্রাল ইত্যাদি স্থানে যাই। এটা শুধু ইংলণ্ডে নয, সুইটজাবল্যাণ্ডে, জারমানিতে, ফ্রান্সে, ইতালিতে ও আরও কযেকটি দেশে। আমাব 'পথে প্রবাসে' বইখানি দীর্ঘকালের প্রস্তুতির ফল।

তেমনটি 'জাপানে' বইখানিব বেলা ঘটেনি। হঠাৎ জাপানে যাবার সুযোগ পেয়ে শান্তিনিকেতনেব লাইব্রেবিতে যে কযখানা জাপান সম্বন্ধে লেখা বই পাই সে কযখানা পডি। অধ্যাপক কাসুগাই আমাকে আরও কিছু মালমসলা যোগান। আগে থেকে আধুনিক জাপানি সাহিত্য সম্বন্ধে লেখা একখানা বই আমাব বাডিতে ছিল। সেটা পাঠিয়েছিলেন মণি মৌলিক। আগে ওটা খুলে দেখিনি। এখন ওটা কাজে লেগে গেল। জাপান থেকে ঘুবে এসে যে সব বইপত্র সঙ্গে এনেছিলুম সেগুলি বেশ কিছুদিন ধবে পডলুম। তাব পরে লিখতে বসলুম জাপানেব কাহিনী।

'জাপানে' বইখানার জনা সাহিত্য অকাদেমির পুবস্কার মিলে যায। তখন কলকাতাব পশ্চিম জারমান কনসাল জেনারেলের কাছ থেকে প্রস্তাব আসে তার দেশে যাবার জন্য। পশ্চিম জাবমানি যাবার পূর্বে এত কম সময় পাই যে একেবাবেই প্রস্তুত হতে পাবিনে। তবে জারমানি আমাব চেনা জায়গা, মনে হলো যেন চেনা জাযগায় ফিবে এসেছি। সেইজন্য আমাব ভ্রমণ কাহিনীব নাম বাখলুম 'ফেরা'। এর পরে ফিবলুম ইংলণ্ডে, তাব পরে ফ্রান্সে, তবে মাঝখানে ছিল চৌত্রিশ বছরের ব্যবধান। প্রায় সব কিছু আমায নূতন করে চিনতে হলো।

'চেনাশোনা' বইখানি লেখা হয ১৯৩৮-৩৯ সালেব কযেক মাসের ভ্রমণ নিয়ে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নয়। অল্প বিস্তর দেবিতে। উদ্দেশ্য ছিল নিজেব দেশকে চেনা। সিংহল ঠিক বিদেশ নয়। এই ভ্রমণ কাহিনীর সঙ্গে আমার নিজেব জীবনেব একটি বিয়োগান্ত ঘটনা জড়িয়ে রযেছে। ভ্রমণ শেষ হয়ে যায় দ্বিতীয পুত্রের প্রয়াণে।

অন্নদাশঙ্কর রায়

লিখেছিলেন সেই রচনার রূপান্তর হতো। লেখকের পরিকল্পনায় ছিল টলস্টয়, থোরো, রাস্কিন, গান্ধী প্রভৃতির ধ্যানের জগৎ, ধ্যানের দেশ। এঁদের কেউ স্বদেশে সিদ্ধিলাভ করেননি, একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন গান্ধী। তাঁকেও ঘটনাচক্রে আপাত ব্যর্থ হতে হলো। দেশ ও প্রদেশ ভেঙে গেল। শুধু এই দিক থেকে নয়, অন্যান্য দিক থেকেও গান্ধীপন্থীদের পক্ষে তা ছিল একটা সেট-ব্যাক। 'এক হিসাবে সেট-ব্যাক, আরেক হিসাবে ফরওয়ার্ড স্টেপ। পদ্মা এককূল ভাঙে, আরেক কূল গড়ে।' দেশের ইতিহাসের বেলাও তাই। ক্রান্তদর্শীতে তারই প্রতিফলন ও রূপারোপ ঘটেছে।

ক্রান্তদর্শীর বিস্তৃত ও জটিল প্রেক্ষাপটটি এই ভূমিকায় বর্ণিত হলো। এই পটভূমির ওপর যে ইমারতটি গড়া হয়েছে তার দার্ঢ্য ও সৌন্দর্য নিয়ে আমরা আলোচনা করবো ত্রয়োদশ খণ্ডের ভূমিকায়। তার আগে আপাতত এখানে বলা দরকার, যদিও এই ভূমিকার সূচনায় ক্রান্তদর্শী প্রসঙ্গে আমরা টলস্টয়ের রেজারেকশনের নামোল্লেখ করেছিলাম, তবু ঘরানার দিক দিয়ে দেখলে ক্রান্তদর্শী বোধহয় টলস্টয়ের ওয়র অ্যাণ্ড পীসেরই সহযাত্রী। বিশেষত জনগণমনঅধিনায়কতার প্রসঙ্গে। এই বিষয়ে এখানে যৎসামান্য আলোচনা করে রাখলে ত্রয়োদশ খণ্ডের ভূমিকায় আমাদের বিশেষ সুবিধা হবে।

ওয়র অ্যাণ্ড পীস সাধারণ উপন্যাসের মতো এক জোড়া নায়ক নায়িকার বৃত্তান্ত নয়। এর নায়ক-নায়িকা হচ্ছে, বলা যায়, স্বয়ং রাশিয়া, রাশিয়ার প্রাণ মন সম্মান। 'অথবা দেশ কালের সীমার মধ্যে স্থিত অসীম মানববংশ। ইতিহাসের সত্যকার বিষয় যদি হয় মানবভাগ্য তবে এই উপন্যাস হচ্ছে

ইতিহাসের ভগ্নাংশ। এর বিষয় এর দেশকালরহিত মানবভাগ্য। এর অসংখ্য পাত্রপাত্রী হচ্ছে মানব - করতলরেখা।'

সাধারণ ঔপন্যাসিক হলে তাঁর পাত্রপাত্রীদের দিয়ে বড় বড় কাজ করাতেন। অথবা যারা বড় বড় কাজ করেছে তাদেরই করতেন পাত্রপাত্রী। সাধারণ ঐতিহাসিক হলে ঘটনার পেছনে দেখতে পেতেন মানুষের ইচ্ছা, মানুষের পরিকল্পনা, মানুষের দূরদৃষ্টি। জাতীয় ঐতিহাসিক হলে জাতীয় গৌরবের রঙে সমস্ত ঘটনাকে করতেন অতিরঞ্জিত। কিন্তু টলস্টয় ঋষি। তাই তিনি দিব্যদৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করেছিলেন ঘটনা কেমন করে ঘটলো, কেমন করে ঘটে থাকা সম্ভব। রাশিয়ার জনগণকেই তিনি দিয়েছেন সাধুবাদ। তারা কোনো ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা চালিত হয়নি। তারা পরস্পরের পরামর্শ নেয়নি। তারা অন্তরে উপলব্ধি করেছিল নিয়তির অভিপ্রায় ও সেই অনুসারে কাজ করেছিল। শেষ জীবনে টলস্টয় যে জনগণের স্বভাব বিজ্ঞতায় আস্থাবান হবেন, অপ্রতিরোধতত্ত্বের গোস্বামী হবেন, তার পূর্বাভাষ তাঁর যৌবনের এই গ্রন্থেই লক্ষ করা যায়।

যদিও ক্রান্তদর্শী ততটা অবজেকটিভ লেখা নয়, তবু টলস্টয়ের নীতি — সাধারণ ঔপন্যাসিকের দৃষ্টি নয়, সাধারণ ঐতিহাসিকের দৃষ্টি নয়, জাতীয় ঐতিহাসিকের দৃষ্টি নয় — অন্নদাশঙ্কর ক্রান্তদর্শীতে অনেকটা অনুসরণ করেছেন এবং এই উপন্যাসের শক্তির এক বড় অংশ সেখান থেকেই উদ্ভূত। টলস্টয়ের অপ্রতিরোধতত্ত্ব দেশান্তরে রূপান্তর পরিগ্রহ করেছে ভারতের সত্যাগ্রহে। গান্ধীজীর জীবনাদর্শে। এবং ক্রান্তদর্শী উপন্যাসমালা সেই স্পিরিটের দ্বারা চালিত : ওয়র অ্যাণ্ড পীসের সঙ্গে ক্রান্তদর্শীর সবচেয়ে বড় মিল এইখানে। নামপরিচয়হীন নির্বিশেষ জনতা কর্ম করে নিয়তির চালনায়। নিয়তি অন্ধ নয়, খেয়ালী নয়, তার ব্যবহারে আছে নিয়ম। সমর থেকে যেমন ওঠে নিয়তির কথা, তেমনি শান্তি থেকে ওঠে প্রকৃতির সহজ বিকাশ ও বিশুদ্ধ অস্তিত্বের । অর্থাৎ মুক্তপ্রাণ জীবনের। 'জীবনই সমস্ত। জীবনই ভগবান। সর্বভূতের আছে গতি। সেই গতিই ভগবান। জীবনকে ভালোবাসলেই ভগবানকে ভালোবাসা হয়। জীবনে সবার চেয়ে কঠিন অথচ সবচেয়ে গুণের কাজ হচ্ছে জীবনের যাবতীয় অহেতুক জ্বালা সত্ত্বেও জীবনকে ভালোবাসা।' গান্ধীর জীবনে তা প্রতিপন্ন হয়েছে। ক্রান্তদর্শী উপন্যাসমালাতেও সেই কথাই এসেছে। সেই অন্তর্নিহিত অর্থে, কল্পনার পরিব্যাপ্তিতে ও সহানুভূতির প্রসারে ক্রান্তদর্শী অন্নদাশঙ্করের সাহিত্যকর্মের মধ্যে অনন্য।

ধীমান দাশগুপ্ত

তাঁদের লেখা হবে অবজেকটিভ। যা ব্যক্তিনিরপেক্ষ সত্য। নভেল লিখলে তার আদল হবে টলস্টয়ের সমর ও শান্তি। কিন্তু তাঁরা আমার মতো প্রত্যক্ষদর্শী হবেন না। আমি দেখেছি, আমি শুনেছি, আমি ভুগেছি, আমি শিখেছি, আমি যে আদৌ অংশ নিইনি তা নয়। এমন সুযোগ ও দুর্ভোগ আমার উত্তরসূরীদের হবে না। আমার মধ্যে প্যাশন প্রবল, আমার বিচার ডিস্‌প্যাশনেট নয়। আমি একজন ভারতীয় জাতীয়তাবাদী, সেই সঙ্গে গান্ধীভক্ত, সেই সঙ্গে পশ্চিমের অনুরাগী, সেই সঙ্গে ইংরেজদের সহযোগী, সেই সঙ্গে মুসলমানদের বন্ধু, সেই সঙ্গে হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে জনগণের সেবক।' ক্রান্তদর্শী এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই লেখা।

যে সমস্ত গ্রন্থ লেখক পড়েছেন তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলো ব্রিটিশ্ সরকার প্রকাশিত বারো খণ্ডে সমাপ্ত মহাগ্রন্থ 'ট্রান্সফার অভ্ পাওয়ার', যার প্রতিটি খণ্ডের পৃষ্ঠা সংখ্যা বড় মাপের হাজারের মতো। এককালের অত্যন্ত গোপনীয় বিষয়বস্তু। নেতারা কে কী বলেছেন, কে কী চেয়েছেন এসব তো আছেই, সরকার পক্ষে কে কী বলেছেন বা লিখেছেন তাও আছে। 'এই বইগুলি না পড়লে আমার চোখ ফুটত না। আমি একতরফা বিচার করতুম। জিন্না সাহেবের দিক থেকেও যথেষ্ট বলবার

আছে। লর্ড ওয়েভেলের দিক থেকেও। . . . . আমাকে আমার অনেক ধারণা সংশোধন করতে হয়েছে।'

ঐতিহাসিক ঘটনাগুলো লেখক জানতেন। কিন্তু ব্যক্তির জীবনের ক্রমপরিণতি জানতেন না। লিখতে লিখতে জানতে পারলেন। উপন্যাস লেখাও একটা নিরুদ্দেশ যাত্রা। 'যেসব তথ্য ত্রিশ বছর আগে কেউ জানত না সেসব আমার উপন্যাসের পাত্রপাত্রীরা জানত কী করে? আর সকলের মতো তারাও ভুল ধারণার দ্বারা চালিত হয়েছিল। ভুল ধারণা থেকে কত কী ঘটে! ঔপন্যাসিক কী করে তাকে অঘটিত করবে? ঔপন্যাসিক তার যুগকে অতিক্রম করতে পারে না।'

রাজনৈতিক নেতাদের বিভিন্ন উক্তি এই গ্রন্থে কখনো ইতিহাসসম্মত আর কখনো কাল্পনিক। লেখক যেখানে পেরেছেন সেখানে লিপিবদ্ধ উক্তি উদ্ধার করেছেন, যাতে ইতিহাসের মর্যাদা রক্ষিত হয়। অন্যত্র উক্তি রচনা করেছেন, তা কাল্পনিক হলেও তাঁদের চরিত্রবিরুদ্ধ নয়। সেই ধরনের উক্তি তাঁদের মুখে যদি কেউ শুনে থাকেন তবে আশ্চর্যের কিছু নেই। 'উপন্যাসের মধ্যে ঐতিহাসিক চরিত্রদের একেবারে অনুপস্থিত রাখা যায় না। টলস্টয়ও কি নেপোলিয়নকে তাঁর 'সমর ও শান্তি'র মধ্যে উপস্থাপিত করেননি? নেপোলিয়নের উক্তিগুলিও কি সর্বতোভাবে ঐতিহাসিক? কোনো অংশই কল্পিত নয়? উপন্যাসের অনুরোধে আমাকেও কিছু কিছু বানাতে হয়েছে।' তবে সেক্ষেত্রেও লেখক যথাসম্ভব ইতিহাসেরই অনুসরণ করেছেন। আরো বেশি অনুসরণ করলে উপন্যাস হতো না, ইতিহাস হতো। কিন্তু লেখক তো উপন্যাসের ছলে ইতিহাস লিখতে বসেননি। তাই এই উপন্যাসে তথ্যের ও ধারা-বাহিকতার কিছু ফাঁকও রয়ে গেছে। ভবিষ্যতে যাঁরা ইতিহাস লিখবেন তাঁরা সে ফাঁক পূরণ করবেন। লেখক উপন্যাস লিখেছেন। ইতিহাসভিত্তিক, রাজনীতিনির্ভর, বিশ্লেষণধর্মী উপন্যাস। ক্রান্তদর্শীতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে বিশ্বের ইতিহাসের, ভারতের ইতিহাসের, বাংলার ইতিহাসের এক যুগসন্ধিকে। 'সে রকম যুগসন্ধি আগেও আসেনি, পরেও আসবে না! ওই একবারই এল আর গেল। দেশ দেশান্তরে কত পরিবর্তনই না ঘটে গেল! সমস্তটাকে একত্র করলে যা দাঁড়ায় তা কি একপ্রকার রিনিউয়াল নয়? আমার পরিকল্পনামতো নয় যদিও।'

লেখকের পরিকল্পিত উপন্যাস প্রায় চল্লিশ বছর আগে তিনি 'নতুন করে বাঁচা' নামে যে প্রবন্ধ লিখেছিলেন সেই রচনার রূপান্তর হতো। লেখকের পরিকল্পনায় ছিল টলস্টয়, থোরো, রাস্কিন, গান্ধী প্রভৃতির ধ্যানের জগৎ, ধ্যানের দেশ। এঁদের কেউ স্বদেশে সিদ্ধিলাভ করেননি, একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন গান্ধী। তাঁকেও ঘটনাচক্রে আপাত ব্যর্থ হতে হলো। দেশ ও প্রদেশ ভেঙে গেল। শুধু এই দিক থেকে নয়, অন্যান্য দিক থেকেও গান্ধীপন্থীদের পক্ষে তা ছিল একটা সেট-ব্যাক। 'এক হিসাবে সেট-ব্যাক, আরেক হিসাবে ফরওয়ার্ড স্টেপ। পদ্মা এককূল ভাঙে, আরেক কূল গড়ে।' দেশের ইতিহাসের বেলাও তাই। ক্রান্তদর্শীতে তারই প্রতিফলন ও রূপারোপ ঘটেছে।

ক্রান্তদর্শীর বিস্তৃত ও জটিল প্রেক্ষাপটটি এই ভূমিকায় বর্ণিত হলো। এই পটভূমির ওপর যে ইমারতটি গড়া হয়েছে তার দার্ঢ্য ও সৌন্দর্য নিয়ে আমরা আলোচনা করবো ত্রয়োদশ খণ্ডের ভূমিকায়। তার আগে আপাতত এখানে বলা দরকার, যদিও এই ভূমিকার সূচনায় ক্রান্তদর্শী প্রসঙ্গে আমরা টলস্টয়ের রেজারেকশনের নামোল্লেখ করেছিলাম, তবু ঘরানার দিক দিয়ে দেখলে ক্রান্তদর্শী বোধহয় টলস্টয়ের ওয়র অ্যাণ্ড পীসেরই সহযাত্রী। বিশেষত জনগণমনঅধিনায়কতার প্রসঙ্গে। এই বিষয়ে এখানে যৎসামান্য আলোচনা করে রাখলে ত্রয়োদশ খণ্ডের ভূমিকায় আমাদের বিশেষ সুবিধা হবে।

ওয়র অ্যাণ্ড পীস সাধারণ উপন্যাসের মতো এক জোড়া নায়ক নায়িকার বৃত্তান্ত নয়। এর নায়ক-নায়িকা হচ্ছে, বলা যায়, স্বয়ং রাশিয়া, রাশিয়ার প্রাণ মন সম্মান। 'অথবা দেশ কালের সীমার মধ্যে স্থিত অসীম মানববংশ। ইতিহাসের সত্যকার বিষয় যদি হয় মানবভাগ্য তবে এই উপন্যাস হচ্ছে

[redacted]
ফলে গল্পের ধারা বদলে যাচ্ছে, অনেক ঘটনাকে রিইণ্টারপ্রেট করার সুযোগ পাচ্ছি। তবে সাধারণভাবে দেশের স্বাধীনতাই মূল বিষয়বস্তু হিসেবে রয়েছে। দেখা যাক। বইটা শেষ করার তাগিদটা বড় কেননা তাহলে একটা দায়িত্ব থেকে মুক্তি পাই।

প্রথম খণ্ড সম্পর্কে প্রদত্ত এই বক্তব্য ক্রান্তদর্শীর চারটি খণ্ড সম্বন্ধেই প্রযোজ্য হতে পারে। ক্রান্তদর্শীতে গান্ধীর ভূমিকা ও ক্রান্তদর্শীর মধ্য দিয়ে লেখকের গান্ধীমূল্যায়ন গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়, ত্রয়োদশ খণ্ডের ভূমিকায় আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করেছি।

ক্রান্তদর্শীকে সত্যাসত্য-এর সিকোয়েল বলা যেতে পারে শুধু বিষয়বস্তুর দিক থেকে নয়, চরিত্র-সূচির দিক থেকেও। দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকায় আমরা বলেছিলাম, সত্যাসত্যের অন্যতর নায়ক সুধীকে আমরা অপেক্ষাকৃত ভিন্ন রূপে ফের ফিরে পাব ক্রান্তদর্শী উপন্যাসমালায়। সুধী এখানে সৌম্য হয়েছে। সৌম্য সুধীই, তবু সুধী নয়। লেখক তাঁকে নিজের মতো করে বাঁচবার ও বাড়বার স্বাধীনতা দিয়েছেন। সৌম্যর ভূমিকাকে ঘিরেই ক্রান্তদর্শী দানা বেঁধেছে। তবে ঘটনার আবর্তে পড়ে সৌম্য সুধীর স্থিতপ্রজ্ঞ স্বরূপ বজায় রাখতে পারেনি। উজ্জয়িনীও এখানে ফিরে এসেছে, জুলি নাম নিয়ে। সে বিধবা হয়েছিল, পরে সৌম্য যতদিন অবিবাহিত থাকে ততদিন তার জন্য অপেক্ষা করেছে ও অবশেষে সৌম্যর পত্নী হয়েছে। সৌম্য একনিষ্ঠ গান্ধীপন্থী, জুলি প্রথমে ছিল সন্ত্রাসবাদী, পরে সৌম্যর প্রভাবে পড়ে গান্ধীবাদের দিকে ঝুঁকেছে।

উজ্জয়িনী ফিরে এলে দে সরকারকেও ফিরে আসতে হয়, সে আসে সুকুমার দত্তবিশ্বাস হয়ে। জুলির দ্বারা বারবার প্রত্যাখ্যাত হয়ে সে জুলির বান্ধবী মিলিকে বিয়ে করে। এই তিনটি পুরোনো চরিত্র ছাড়া আর সব চরিত্রই নতুন। মানস বাদল নয়, যদিও সৌম্যর পুরাতন বন্ধু। মানস চরিত্রে লেখকের বিশেষ আত্মপ্রক্ষেপও ঘটেছে। তবে 'মানসের সঙ্গে যথেষ্ট মিল থাকলেও আমি মানস নই বা মানস আমি নয়। তার যূথিকাও আমার স্ত্রী লীলা নয়।' সৌম্য ছাড়া এই উপন্যাসের আর দুই অন্যতম নায়ব মানস ও স্বপনদা।

'অনেকগুলি চরিত্রই জীবন থেকে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু আস্তভাবে নয়। তারা যে যার নিজের মতো করে বেঁচেছে ও বেড়েছে। আমার শাসন মানেনি। নায়িকা যে কোন্ জন তাও আমি জানিনে। জুলি ও যূথিকার মতো দীপিকাদিও তিনজনের একজন। তিনটি পরিবারকেই এই উপন্যাসে সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কোনো একটিকে বিশেষ গুরুত্ব নয়।'

চরিত্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে কোনো একটি চরিত্রের মডেল বিশেষ কোনো একজন নয়। প্রতিটি চরিত্রের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য একাধিক ব্যক্তির কাছ থেকে তিল তিল করে সংগ্রহ করা হয়েছে। যেমন ঐতিহাসিক ঘটনাবলী ও রাজনৈতিক নেতাদের কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে সংগ্রহ করতে হয়েছে। ফরাসি বিপ্লবের পটভূমিকায় একটি উপন্যাস লেখার আগে ডিকেন্স কার্লাইলকে চিঠি লিখে জানতে চান কোন্ কোন্ বই পড়বেন। উত্তরে কার্লাইল একগাড়ি বই পাঠিয়ে দেন। ডিকেন্স অবশ্য অত পড়েননি। 'একগাড়ি না হোক, বেশ কিছু বই আমাকেও পড়তে হয়েছে। . . . . ভবিষ্যতে এই বিষয়ে আরো যাঁরা লিখবেন তাঁরা আমার চেয়ে ভাগ্যবান, তাঁরা এক গাড়ি কি দু'গাড়ি বই পড়ে লিখবেন। তাঁদের লেখা হবে অবজেকটিভ। যা ব্যক্তিনিরপেক্ষ সত্য। নভেল লিখলে তার আদল হবে টলস্টয়ের সমর ও শান্তি। কিন্তু তাঁরা আমার মতো প্রত্যক্ষদর্শী হবেন না। আমি দেখেছি, আমি শুনেছি, আমি ভুগেছি, আমি শিখেছি, আমি যে আদৌ অংশ নিইনি তা নয়। এমন সুযোগ ও দুর্ভোগ আমার উত্তরসূরীদের হবে না। আমার মধ্যে প্যাশন প্রবল, আমার বিচার ডিস্‌প্যাশনেট নয়। আমি একজন ভারতীয় জাতীয়তাবাদী, সেই সঙ্গে গান্ধীভক্ত, সেই সঙ্গে পশ্চিমের অনুরাগী, সেই সঙ্গে ইংরেজদের সহযোগী, সেই সঙ্গে মুসলমানদের বন্ধু, সেই সঙ্গে হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে জনগণের সেবক।' ক্রান্তদর্শী এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই লেখা।

যে সমস্ত গ্রন্থ লেখক পড়েছেন তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলো ব্রিটিশ সরকার প্রকাশিত বারো খণ্ডে সমাপ্ত মহাগ্রন্থ 'ট্রান্সফার অভ্ পাওয়ার', যার প্রতিটি খণ্ডের পৃষ্ঠা সংখ্যা বড় মাপের হাজারের মতো। এককালের অত্যন্ত গোপনীয় বিষয়বস্তু। নেতারা কে কী বলেছেন, কে কী চেয়েছেন এসব তো আছেই, সরকার পক্ষে কে কী বলেছেন বা লিখেছেন তাও আছে। 'এই বইগুলি না পড়লে আমার চোখ ফুটত না। আমি একতরফা বিচার করতুম। জিন্না সাহেবের দিক থেকেও যথেষ্ট বলবার

আছে। লর্ড ওয়েভেলের দিক থেকেও। . . . . আমাকে আমার অনেক ধারণা সংশোধন করতে হয়েছে।'

ঐতিহাসিক ঘটনাগুলো লেখক জানতেন। কিন্তু ব্যক্তির জীবনের ক্রমপরিণতি জানতেন না। লিখতে লিখতে জানতে পারলেন। উপন্যাস লেখাও একটা নিরুদ্দেশ যাত্রা। 'যেসব তথ্য ত্রিশ বছর আগে কেউ জানত না সেসব আমার উপন্যাসের পাত্রপাত্রীরা জানত কী করে? আর সকলের মতো তারাও ভুল ধারণার দ্বারা চালিত হয়েছিল। ভুল ধারণা থেকে কত কী ঘটে! ঔপন্যাসিক কী করে তাকে

লেখক আমাকে বলেছেন এটি তাঁর সবচেয়ে ম্যাচিওর লেখা, গুণমানের দিক থেকে সব চাইতে উঁচু দরের। সেই সাক্ষাৎকারের কথা পরে আসবে।

১৯২৭ থেকে ১৯২৯ পর্যন্ত দু'বছর কালসীমার সত্যাসত্যের জন্য ছয় খণ্ড লেগেছিল। সেই অনুসারে ক্রান্তদর্শী লিখতে আরো বেশি খণ্ড লাগাই সমীচীন। কেননা এই কাহিনীর কালসীমা হলো ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৪৮ সালের জানুয়ারি। হিটলারের পোলাণ্ড আক্রমণ থেকে মহাত্মা গান্ধীর চিতারোহণ পর্যন্ত। কিন্তু লেখক বয়সের কথা ভেবে, বার্ধ্যকের কথা মনে রেখে যথাসম্ভব সংক্ষেপে লেখেন ও চার খণ্ডে সারেন। তাঁর ব্যক্তিগত মত পাঁচ পর্বে লিখতে পারলে তৃপ্তি হতো।

এ গেলো কালের কথা। স্থানের কথায় বলতে হয় কাহিনীর প্রয়োজনে ঘটনাস্থল কখনো কলকাতা, কখনো পূর্ববঙ্গ, কখনো পশ্চিমবঙ্গ, আর সবশেষে দিল্লী।

পাত্রপাত্রী বলতে একদিকে সৌম্য-জুলি, মানস-যূথিকা, স্বপনদা-দীপিকাদির মতো একরাশ কাল্পনিক চরিত্রাবলী, অন্যদিকে জবাহরলাল, জিন্না, বল্লভভাই, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, সুহরাবর্দির মতো অনেক ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব। একদিকে কাল্পনিক পাত্রপাত্রীরাও যেমন লেখকের কাছে জীবন্ত মানুষ ও আপনজন, অন্যদিকে তেমনি ঐতিহাসিক নেতাদের সংলাপে ও চরিত্রায়ণেও আছে কল্পনার অংশ। সেই প্রসঙ্গটি নিচে আলোচিত হয়েছে।

আমি এখনো গান্ধীর নামোল্লেখ করিনি, কেননা আমি মনে করি গান্ধী এ উপন্যাসের নিছক কোনো চরিত্র নন, বরং এই গ্রন্থমালার গাইডিং ফোর্স বা চালকশক্তিই তিনি। ক্রান্তদর্শীর প্রকৃত নায়ক। লেখকের সঙ্গে আমার ১৯৮৩-তে নেওয়া ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার থেকে উদ্ধৃত করছি—

আমার প্রশ্নের বিষয় ঃ আপনার সাম্প্রতিক উপন্যাস ক্রান্তদর্শী। ৩৫ বছর ধরে এই বই লিখবেন বলে তৈরি হয়েছেন, চারখণ্ডে লেখা হবে, জীবনের বড় একটা কাজ। প্রথম খণ্ড শেষ করেছেন, তা পড়েওছি। বক্তব্য ও বিবরণ প্রধান। বিশ্বজনীন দৃষ্টিতে একটা দেশের সন্ধিকালকে ধরতে গেলে বক্তব্যের কিছুটা প্রাধান্য ঘটবেই। সার্ত্রর রোডস টু ফ্রীডম উপন্যাসমালাতেও তা ঘটেছে, এতে কোনো ক্ষতি নেই। ক্রান্তদর্শীর যতটা পড়েছি তা পড়ে একটা অদ্ভুত মননশীল তৃপ্তি পাওয়া যায়। তা আমাদের মতো তরুণ পাঠকদের কাছে, ভারতের জাতীয় সংগ্রাম সম্পর্কে যাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নেই তাদের কাছে, দূরবীনে দূরের জগৎ দেখার মতো উত্তেজনাময় ও স্পন্দনশীল এক অনুভূতি। বারাব্বাস উপন্যাসের নায়ক যেমন অদৃশ্য নায়ক যীশুখ্রীস্ট — the invisible hero, ক্রান্তদর্শীর নায়ক তেমনি গান্ধী। চার খণ্ড লিখে শেষ করতে ও প্রকাশ পেতে সময় লাগবে। তার আগে এই উপন্যাসের উদ্দেশ্য, পরিকল্পনা ও কাঠামো সম্বন্ধে আরো কিছু জানতে ইচ্ছে হয়।

লেখকের উত্তর ঃ সত্য, প্রেম, সৌন্দর্য ঃ এ ছাড়াও আর একটা থিম বহুদিন ধরে আমাকে নাড়া দিচ্ছিল, তা হলো রিনিউয়াল। একটা দেশের, একটা জাতির রিনিউয়াল। যা একটা উপন্যাসের মধ্য দিয়ে বলতে হবে। যতদিন পারি এই থিমকে ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টা করেছি। কিন্তু শেষে দেখলাম আমি ছাড়া আর কেউ লিখতে পারবে না, কেননা আমার কাছে যত তথ্য আছে তেমন আর কারুর কাছে নেই, তখন লেখায় হাত দিলুম। একদিক দিয়ে দেখলে একে সত্যাসত্য-এর সিকোয়েল বলতে পারো। তবে এতে মহাত্মাজীকে এনেছি। তাঁকে indirectly রেখেছি এ বইয়ে, তাঁকে প্রত্যক্ষভাবে আঁকার শক্তি আমার নেই, কারও আছে কিনা সন্দেহ। তেমন করে আঁকতে বহুকাল লেগে যাবে। পরোক্ষভাবে তাঁকে এনেছি, তাঁর উপস্থিতি নানাভাবে অনুভূত হচ্ছে। এই বইয়ের পথ খুব কঠিন পথ। অসংখ্য রাজনৈতিক ঘটনা। বহু বাস্তব ও কাল্পনিক চরিত্র। তার মধ্যে কোন্ কোন্‌টাকে রাখবো ভেবে বার করতে হচ্ছে। কীভাবে রাখবো তাও ভাবতে হচ্ছে। প্রথম খণ্ড শেষ করে যে আমি সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট তা নয়। কিন্তু এর চেয়ে ভালোভাবে আর করা গেল না। মানুষ যা ভাবে সবসময় তা হয় না। তবে যেটা হয় সেটাও কিন্তু কম নয়। এ আমি আমার নিজের জীবনেই দেখেছি। জীবনের কোনো ঘটনা বা নিজের কোনো সৃষ্টি হয়তো best হলো না, কিন্তু next to the best হতে পারে। ক্রান্তদর্শী যতটা লিখেছি হয়তো খুব ভালো হয়নি, তবে খারাপও হয়নি। লিখতে লিখতে অনেক আন্‌ফোরসীন, আন্‌প্রেডিক্টেব্‌ল্ জিনিস আসছে, ফলে গল্পের ধারা বদলে যাচ্ছে, অনেক ঘটনাকে রিইন্টারপ্রেট করার সুযোগ পাচ্ছি। তবে সাধারণভাবে দেশের স্বাধীনতাই মূল বিষয়বস্তু হিসেবে রয়েছে। দেখা যাক। বইটা শেষ করার তাগিদটা বড় কেননা তাহলে একটা দায়িত্ব থেকে মুক্তি পাই।

প্রথম খণ্ড সম্পর্কে প্রদত্ত এই বক্তব্য ক্রান্তদর্শীর চারটি খণ্ড সম্বন্ধেই প্রযোজ্য হতে পারে। ক্রান্তদর্শীতে গান্ধীর ভূমিকা ও ক্রান্তদর্শীর মধ্য দিয়ে লেখকের গান্ধীমূল্যায়ন গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়, ত্রয়োদশ খণ্ডের ভূমিকায় আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করেছি।

ক্রান্তদর্শীকে সত্যাসত্য-এর সিকোয়েল বলা যেতে পারে শুধু বিষয়বস্তুর দিক থেকে নয়, চরিত্র-সূচির দিক থেকেও। দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকায় আমরা বলেছিলাম, সত্যাসত্যের অন্যতর নায়ক সুধীকে

'গত শতাব্দীর ভাবুকরা এদেশের রেনেসাঁস নিয়ে ভাবিত ছিলেন। এই শতকে আমরা কেউ কেউ তেমনি রিনিউয়াল নিয়ে ভাবিত।'

কিন্তু উপন্যাসের নাম পুনর্নবীকরণ তো ভালো শোনায় না, তাই দীর্ঘ অন্বেষণের পর নাম ঠিক হয় ক্রান্তদর্শী। শঙ্করভাষ্যে কবি হচ্ছেন ক্রান্তদর্শী। লেখক তাঁর ব্যক্তিগত বিবৃতিতে ক্রান্তদর্শীর ইংরেজী করেছেন একবার The Seer, আরেকবার The Watcher of Transition. ক্রান্তদর্শী শব্দটার মধ্যেই একটা দর্শনের কথা আছে। ইংরেজিতে যাকে বলে ভিশন। এই উপন্যাসের আড়ালে আছে একটা বিশেষ দৃষ্টি।

'Krantadarshi surveys the history of this century from an Indian perspective Its

protagonist has seen the two world wars, struggle for independence, the famine of Bengal in the 40s, the Hindu - Muslim riots culminating in the partition of India, and India's gaining of independence. I have scattered myself among various characters in this novel and have tried to look at this history from different angles. It is a record of my personal impressions on certain very important events of this country, which I feel impelled to preserve for posterity'.

'This story of the last years of the British rule needed an epilogue and an epitaph.So Krantadarshi was carried forward to the point of the Mahatma's death and cremation. What could be more tragic than this unhappy ending of a great drama ? Greater love hath no man than this, that he lay down his life for his friends : I quote this from the Bible '

আরম্ভের সময় ক্রান্তদর্শীর থিম ছিল রিনিউয়াল । কিন্তু চারখণ্ড লিখতে লিখতে লেখক তার থেকে সরে আসেন। উপন্যাসের চলার তো একটা নিজস্ব নিয়মও আছে। লেখককে সে নিয়ম মানতে হয়। উপন্যাস একজনের সৃষ্টি একথা যেমন ঠিক তেমনি একথাও ঠিক যে উপন্যাস শুধুই একজনের সৃষ্টি নয়। কারণ উপন্যাসের বিষয়বস্তু মাত্র একজনের ভাবনা চিন্তা নয়, অনেকগুলি মানুষের বহমান জীবনধারা। তাই ক্রান্তদর্শী যখন শেষ হলো তখন তা লেখকের পরিকল্পিত রিনিউয়াল বা পুনর্নবায়ন নয়। পরিকল্পনা অনুযায়ী থিসিস লেখা যায়, কিন্তু উপন্যাস নয়। যদিও ক্রান্তদর্শী চারখণ্ডের সমস্তটা একত্র করলে যা দাঁড়ায় তাও একপ্রকার রিনিউয়ালই বটে, লেখকের পরিকল্পনামতো নয় যদিও। এই প্রসঙ্গে আমরা পরে আসছি।

আর সেই সূত্রেই আসে রচনারীতির কথা। বিষয়বস্তু ও দৃষ্টিভঙ্গির পর শৈলীর কথা। এই উপন্যাস জাতে সাবজেকটিভ। কিন্তু ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়। ইতিহাসের পটভূমিকায় বিভিন্ন চরিত্রের উপাখ্যান তথা জীবনদর্শন। জীবন বলতে অন্তর্জীবনও বোঝায়। 'আমার এই উপন্যাসে অন্তর্জীবনই প্রাধান্য পেয়েছে। একে নভেল অভ্ আইডিয়াজ্ বললে আমি আপত্তি করব না। রবীন্দ্রনাথ যাকে বলতেন ইন্টেলেকচুয়াল উপন্যাস।' লেখকের মতে এই উপন্যাস ইতিহাসভিত্তিক হলেও ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়। রাজনীতিনির্ভর হলেও রাজনৈতিক উপন্যাস নয়। বলতে পারা যায় বিশ্লেষণধর্মী মানবিক স্টেটমেন্ট।

লেখক একবার লিখেছিলেন, 'দুনিয়ায় যেসব জোরালো বই লেখা হয়েছে সেসব বই লেখকদের বল বয়স থাকতে', মোটামুটি ভাবে পঞ্চাশের পূর্বে। সাধারণভাবে বিজ্ঞানীদের বিজ্ঞানকর্মের ক্ষেত্রেও তাই। বিখ্যাত বিজ্ঞানীরা যে কাজের জন্য ষাট বা সত্তর বছর বয়সে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন, সেই গবেষণা বা আবিষ্কারটি তারা করে ফেলেছিলেন ত্রিশ বা চল্লিশ বছর বয়সেই।

অন্নদাশঙ্কর কিন্তু ছিয়াত্তর বছর বয়সে ভাঙা শরীর নিয়ে ক্রান্তদর্শী আরম্ভ করেন আর তা যখন শেষ হয় তখন তাঁর বিরাশি বছর পূর্ণ হয়েছে, এই উপন্যাস লিখতে ও সংশোধন করতে লেগে গেছে সাত বছর। বৃদ্ধ বয়সের লেখা হলেও ক্রান্তদর্শী খুবই বলবান ও রূপবান। একটা ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে লেখক আমাকে বলেছেন এটি তাঁর সবচেয়ে ম্যাচিওর লেখা, গুণমানের দিক থেকে সব চাইতে উঁচু দরের। সেই সাক্ষাৎকারের কথা পরে আসবে।

১৯২৭ থেকে ১৯২৯ পর্যন্ত দু'বছর কালসীমার সত্যাসত্যের জন্য ছয় খণ্ড লেগেছিল। সেই অনুসারে ক্রান্তদর্শী লিখতে আরো বেশি খণ্ড লাগাই সমীচীন। কেননা এই কাহিনীর কালসীমা হলো ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৪৮ সালের জানুয়ারি। হিটলারের পোলাণ্ড আক্রমণ থেকে মহাত্মা গান্ধীর চিতারোহণ পর্যন্ত। কিন্তু লেখক বয়সের কথা ভেবে, বার্ধ্যকের কথা মনে রেখে যথাসম্ভব সংক্ষেপে লেখেন ও চার খণ্ডে সারেন। তাঁর ব্যক্তিগত মত পাঁচ পর্বে লিখতে পারলে তৃপ্তি হতো।

এ গেলো কালের কথা। স্থানের কথায় বলতে হয় কাহিনীর প্রয়োজনে ঘটনাস্থল কখনো কলকাতা, কখনো পূর্ববঙ্গ, কখনো পশ্চিমবঙ্গ, আর সবশেষে দিল্লী।

পাত্রপাত্রী বলতে একদিকে সৌম্য-জুলি, মানস-যূথিকা, স্বপনদা-দীপিকাদির মতো একরাশ কাল্পনিক চরিত্রাবলী, অন্যদিকে জবাহরলাল, জিন্না, বল্লভভাই, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, সুহরাবর্দির মতো অনেক ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব। একদিকে কাল্পনিক পাত্রপাত্রীরাও যেমন লেখকের কাছে জীবন্ত মানুষ ও আপনজন, অন্যদিকে তেমনি ঐতিহাসিক নেতাদের সংলাপে ও চরিত্রায়ণেও আছে কল্পনার অংশ। সেই প্রসঙ্গটি

প্রাসঙ্গিক

সত্যাসত্য এবং রত্ন ও শ্রীমতীর পর অন্নদাশঙ্করের তৃতীয় ও সর্বশেষ বৃহৎ উপন্যাস হলো চার খণ্ডে সমাপ্ত ক্রান্তদর্শী। সত্যাসত্য যদি হয় অন্নদাশঙ্করের ওয়র অ্যাণ্ড পীস আর রত্ন ও শ্রীমতী তাঁর আনা কারেনিনা, তাহলে ক্রান্তদর্শীকে হয় তো বলা যেতে পারে তাঁর রেজারেকশন। এই উপন্যাসমালা নিয়ে লেখক দীর্ঘদিন ধরে প্রস্তুত হয়েছেন, চিন্তান্বিত থেকেছেন, লিখবো কি লিখবো না এই দোটানায় ভুগেছেন। উদাহরণ দিচ্ছি —

'ভারতের জাতীয় সংগ্রামকে মহাভারতে রূপায়িত করার যে কল্পনা ছিল আমার আমি সেটা যোগ্যতরের জন্যে রেখে যাবো।' (১৯৫১)

'(এখন) গল্পের চেয়ে উপন্যাস নিয়েই আমার চিন্তা। ত্রিশ বছর ধরে যে বই লিখব বলে তৈরি হচ্ছি সেটা এখনো শুরু হয়নি। জীবনের একটা কাজ অসমাপ্ত রয়ে যাচ্ছে।' (১৯৭৫)

'(আমাদের কালের যুগান্তকারী ঘটনা হলো) স্বাধীনতা প্রাপ্তি। আমরা কোনদিন ভাবিনি আমাদের জীবদ্দশায় স্বাধীনতা আসবে। দেশটা চোখের সামনে ভেঙে গেল। এর জন্য আমরাও দায়ী। এসব কথা আর কেউ লিখবে ভেবেছিলাম — যারা এর মধ্যে involved নয়। একটা দূরত্ব চাই একথা লেখার জন্য। কিন্তু দেখলাম, আমি যদি না লিখি তাহলে আর কেউ লিখবে না। আর কারও অভিজ্ঞতা নেই। যে সব সরকারি সার্কুলারে দেশের অঙ্গচ্ছেদ হয়েছে, নানা টানাপোড়েন হয়েছে সে সব আর কে দেখেছে আমি ছাড়া? ১৯৩৯ - ৪৮ এই কয়েক বছরে যা দেখেছি, যা শুনেছি তা ক্রান্তদর্শীর মধ্যে রয়েছে'।(১৯৮৭)

চেনা-জানা অনেক চরিত্র এসেছে এই মহোপন্যাসে। তখনকার দিনের রঙ্গমঞ্চের অভিনেতা এরা। যে দেশ, দেশভাগের ফলে বরাবরের মতো হারিয়ে গেছে, তা রূপ পেয়েছে ক্রান্তদর্শীতে। ভারতের জাতীয় সংগ্রাম যার বিষয়বস্তু। বহিরঙ্গের দিক থেকে।

অন্তরঙ্গের দিক থেকে 'আমার এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু ইংরেজীতে যাকে বলে রিনিউয়াল। পুনর্নবীকরণ। টলস্টয়ের ধ্যানের রেজারেকশন আর আমার ধ্যানের রিনিউয়াল অবশ্য একই জিনিস নয়। তবু পুনরুত্থান ও পুনর্নবীকরণ দুটোই পুনঃ।'

'গত শতাব্দীর ভাবুকরা এদেশের রেনেসাঁস নিয়ে ভাবিত ছিলেন। এই শতকে আমরা কেউ কেউ তেমনি রিনিউয়াল নিয়ে ভাবিত।'

কিন্তু উপন্যাসের নাম পুনর্নবীকরণ তো ভালো শোনায় না, তাই দীর্ঘ অন্বেষণের পর নাম ঠিক হয় ক্রান্তদর্শী। শঙ্করভাষ্যে কবি হচ্ছেন ক্রান্তদর্শী। লেখক তাঁর ব্যক্তিগত বিবৃতিতে ক্রান্তদর্শীর ইংরেজী করেছেন একবার The Seer, আরেকবার The Watcher of Transition. ক্রান্তদর্শী শব্দটার মধ্যেই একটা দর্শনের কথা আছে। ইংরেজিতে যাকে বলে ভিশন। এই উপন্যাসের আড়ালে আছে একটা বিশেষ দৃষ্টি।

'Krantadarshi surveys the history of this century from an Indian perspective Its

protagonist has seen the two world wars, struggle for independence, the famine of Bengal in the 40s, the Hindu - Muslim riots culminating in the partition of India, and India's gaining of independence. I have scattered myself among various characters in this novel and have tried to look at this history from different angles. It is a record of my personal impressions on certain very important events of this country, which I feel impelled to preserve for posterity'.

'This story of the last years of the British rule needed an epilogue and an epitaph.So Krantadarshi was carried forward to the point of the Mahatma's death and cremation. What could be more tragic than this unhappy ending of a great drama ? Greater love hath

অন্নদাশঙ্কর রায়ের রচনাবলী

দ্বাদশ খণ্ড